জোন্সটাউন হত্যাকান্ড

একটা ঘুমহীন রাত কাটালাম। বিজয় দিবসে গভীর রাত পর্যন্ত আমার সন্তানদের নিয়ে সারা শহর ঘুরে বেড়িয়েছি এবং তাদের বিজয় দিবসের তাৎপর্য বুঝিয়েছি। গল্পচ্ছলে শুনিয়েছি বাংলা ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বদানের ইতিহাসের সাথে, মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানের ইতিহাসের সাথে এবং ২১'ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে জাতিসংঘের স্বীকৃতি প্রদানের ইতিহাসের সাথে আমার পরিবারিক ইতিহাসের সম্পৃক্ততা। বাসায় ফিরেই বিজয় দিবসের প্রথম প্রহরের উপহার হিসেবে হাতে পেলাম মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকাশিত সুনামগঞ্জের রাজাকারের তালিকা। তালিকা পড়ার পর আমি স্তম্ভিত, হতভম্ভ, বাকরুদ্ধ অবস্থায় বসে রইলাম বহুক্ষণ। এটা কিসের তালিকা, কেন এই তালিকা? জাতিকে বিভ্রান্ত করার জন্যই কি এটা করা হয়েছে নাকি কিছু মানুষকে "ক্লীন চীট" দেবার জন্য এটা করা হয়েছে বুঝলাম না। যদি বিশ্বাসই করি মুক্তিযুদ্ধের এতো বছর পর এসে জাতিকে সরকারি ভাবে বিভক্ত না করার ইচ্ছে থেকে এটা করা হয়েছে, তারপরও, এই তালিকা এবং তালিকা প্রণয়ন নিয়ে আমার একটা কথা আছে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয়কে জাতির সাথে তামাশা করার অনুমতি কবে দেয়া হয়েছে। এর জন্য কাউকে না কাউকে জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, জাতির কাছে ক্ষমা চাইবার বিষয়ে আমার দায়ীত্ব কতটুকু সেটা নিয়ে ভাবতে ভাবতেই দেখি ফজরের আজান।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার দশ বছর বয়সকে বাচ্চা ছেলে বললে ভুল হবে না কিন্তু তখনও বিপদ সঙ্কুল শব্দটাকে উপলব্ধি করার বোধশক্তি কাজ করতো। বহু বিপদ সংকুল পথ পারি দিতে হয়েছে। মৃত্যুকে সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা আছে, পাশের গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে দেখতে পেয়ে গোলাগুলির মাঝ দিয়ে মৃত্যুকে পাথেয় করেই হেঁটে পেরিয়েছি শতশত মাইল। সেই কারণে নিজেকে মৃত্যুঞ্জয়ী ভাবলে কেউ দোষ ধরতে পারবে না। মুক্তিযুদ্ধে মৃত্যুকে জয় করলেও আজ এই তালিকা দেখে আমি প্রথমে বুঝতেই পারছিলাম না, আঘাতের ভয়াবহতার কারণে আমি আহত নাকি নিহত।

আমার প্রথম প্রশ্ন, একজন জেলা প্রশাসককে কেন এই গুরু দায়ীত্ব দেয়া হল। দেশের ৬৪টি জেলার ডেপুটি সেক্রেটারি পদমর্যাদার এই সরকারী প্রতিনিধির পক্ষে কিভাবে সম্ভব তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং জেলার ক্ষমতাবান মহল সহ নুন্যতম দশহাজার ব্যক্তির প্রভাব এড়িয়ে একটি সুষ্ঠু তালিকা প্রণয়নের। মানবাধিকার বিরোধী ট্রাইবুনালের নথি সমুহের বা/এবং মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের সহযোগীতা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয় নিজেই এই কাজটি করতে পারতো। জনাব শামসুল আরেফিন যদি ব্যক্তি উদ্যোগে বিতর্কহীন ভাবে তেত্রিশ হাজার রাজাকারের তালিকা প্রণয়ন করতে পারেন তাহলে মন্ত্রনালয় সেটার চেয়ে ভাল কিছু করতে পারবে না সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। শামসুল আরেফিন সাহেব এখনো জীবিত আছেন, তার সাথে এই তালিকা সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা প্রশাসকেরা যোগাযোগ করেছেন কিনা আমার জানা নেই কিন্তু এই তালিকার কারণে জীবিত সকল মুক্তিযোদ্ধা, ট্রাইবুনালের তদন্তের সাথে সম্পৃক্ত সকল মানুষ থেকে শুরু করে আরেফিন সাহেবকেও ভবিষ্যৎ প্রশ্নের সম্মুখীন করানোর ব্যবস্থা করা হল।

আমার ভয়ের কারণ খুব সামান্য। তালিকাটি তৈরী করা হয়েছে সরকারী ভাবে, মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অবস্থায়। ভবিষ্যতে কোন কারণে যদি ২০০১ সালের মত মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারীদের নিয়ে কখনো সরকার গঠিত হয় তখন যুক্তি নির্ভর বিষধর ইতিহাসবেত্তাদের দ্বারা দংশিত ইতিহাসের নমুনা কল্পনা করে আমি আতংকগ্রস্থ। আমার নিজ জেলা

সুনামগঞ্জে বহু রাজাকার ছিল। সবচেয়ে বড় রাজাকার ছিল বিখ্যাত মাহমুদ আলী। রাজাকার হতে পেরে গর্বিত ঘোষনা দেয়া এই লোকটি মুক্তিযুদ্ধের পর পাকিস্তানের বাসিন্দা হয়ে আমৃত্যু পাকিস্তানের মন্ত্রী পদ অলংকৃত করলেও তালিকায় তার নাম না রাখবার বন্দোবস্ত করে তালিকা প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষকে ধন্য করেছে। তালিকার একটি নামে এসে আমার চোখ আটকে গেল।

সুনামগঞ্জের মধ্যশহরের আব্দুস সামদ। সুনামগঞ্জের বহু রাজাকারের নাম জানা থাকলেও বিখ্যাত সব রাজাকারের নামের ভিড়ে এই ভদ্রলোকের নাম অখ্যাত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হাঙ্গেরীর প্রেসিডেন্ট আমার পিতাকে আজাদ নাম দেবার কারণে মুক্তিযুদ্ধের পর আমার পিতা নিজের নামের সাথে আজাদ লাগিয়েছিলেন এবং পরবর্তিতে আব্দুস সামাদ আজাদ নামেই পরিচিত হয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে তার নাম আব্দুস সামাদ, ৫৪' সালের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন ঐ আব্দুস সামাদ নামেই। বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় তার নাম বহু যায়গায় পাওয়া যাবে বলে আমি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি কিন্তু মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় আব্দুস সামাদ বা আব্দুস সামাদ আজাদ কোন নামেই তার নাম নেই।

এবার চলে যাই একটু কল্পনার জগতে। আজ থেকে বিশ বছর পর আমি বা আমার সমসাময়িক ব্যক্তিরা, যারা আব্দুস সামাদ আজাদ সম্পর্কে কিছু জানেন তারা সকলেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছি, সেই সময়ে আবার সেই ২০০১ সালের সরকারের মত এক সরকার ক্ষমতায় এসেছে, সেই সময়ের একটি কল্পনার জগত সাজানো যাক।

তাদের ইতিহাস বিকৃতির প্রথম ঘোষনা, "বিশ বছর আগে আওয়ামীলীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত রাজাকার তালিকার আব্দুস সামাদকে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশ পুনর্গঠনের লক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের দায়ীত্ব দিয়ে তৎকালীন সরকার যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিল সেই একই বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে আমরা দেশকে এগিয়ে নিতে চাই"। আমি এই সম্ভবনাকে উড়িয়ে দিতে পারি নাই বিধায় এই লেখার মধ্য দিয়ে আমার সন্তানদের দ্ব্যার্থহীন কন্ঠে জানিয়ে যেতে চাই, তোমাদের দাদা রাজাকার ছিলেন না। আওয়ামীলীগে অনুপ্রবেশকারী পরবর্তি প্রজন্মের নেতৃবৃন্দ আমার এই ঘোষনাকে বিশ বছর পর বাংলা প্রবাদ দিয়ে তোমাদের দংশিত করার চেষ্টায় বলবে, "ঠাকুর ঘরে কে রে, আমি কলা খাইনা", তারপরও তোমরা সেই দংশনের বিষে নীল হ'য়ে যেওনা।

আমার এই কথা গুলোকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বসে অনেকেই হয়তো আতংকগ্রস্থ মানুষের প্রলাপ বলে এড়িয়ে যেতে চাইবেন, তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, বর্তমানে বহু মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে থাকা অবস্থাতেই যদি পাকিস্তানী দালালদের দ্বারা গঠিত "শান্তি কমিটি"র চেয়ারম্যানের নাম তালেব আলী থেকে তালেব হোসেন হ'য়ে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা সাজবার চেষ্টা চলতে পারে তাহলে আমার আতংকও অসম্ভব কিছু নয়। আমি বেশীদূরে যাবো না। আমার নির্বাচনী এলাকার দুই উপজেলার কথা শুধু সংক্ষেপে বলি। যে তালিকা বানানো হয়েছে সেই তালিকায় একটি উপজেলাকে রাজাকার শুন্য ঘোষনা করা হয়েছে। তাহলে হেরু মুন্সী আর সাত্তার রাজাকারের নেতৃত্বে যে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল, তালেব, কৃপেণ দাস সহ অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়েছিল তারা কারা বা তারা কোথায় গেল।

আরেক উপজেলার অবস্থা তো আরও ভয়াবহ। আজিজুর রহমান চৌধুরী নামের একজন রাজাকারের নামের পরিচয়ে এমন একটি গ্রামের নাম বলা হয়েছে, যে গ্রামের অস্তিত্ব আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে নাই, সুতরাং, ঐ ভদ্রলোকও অস্তিত্বহীন। "সিলেটের ইতিহাস" বইটির লেখক এ.বি.এম. মুনিরুদ্দিন চৌধুরী নামে আর একজন মাত্র রাজাকার খুঁজে পেয়েছে তারা এই উপজেলায়। এই বুদ্ধিজীবি রাজাকার তালিকায়

নাম উঠাতে পেরে নিশ্চয়ই পুলকিত। এই ব্যক্তি অবশ্যই একজন নামকরা পাকিস্তানী দালাল এবং এই উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবীরোধীদের সংগঠিত করায় ব্যাপক ভুমিকা থাকলেও সে মুক্তিযুদ্ধের বহু আগেই এলাকা ছেড়ে সিলেট বসবাসরত। তার গুষ্ঠীগাড়া থেকে শুরু করে তার বাড়ি ঘরের অস্তিত্ব পর্যন্ত অত্র এলাকায় নেই। সুতরাং, তার নামের ঠিকানা এই উপজেলা হলে ভবিষ্যত প্রজন্ম তাকে খুঁজে পাবেনা। অথচ তার নিজের ইউনিয়নের শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মানিক মিয়ার নেতৃত্বে জগন্নাথপুর ইউনিয়নের দুর্ধর্ষ রাজাকার আহমেদকে দিয়ে সকল কুকর্ম করে বেড়াতো তাদের নাম নেই। আমার জানা মতে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আসাব মিয়া এবং ছায়েম মিয়ারা ছিল এই উপজেলার রাজাকারদের মূল নেতৃত্বদানকারী, তাদের নাম নেই। এই উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অন্যতম গণহত্যা, "শ্রীরামশ্রী গণহত্যা"র নায়কের নামও উধাও এই তালিকায়।

সত্তরের দশকের শুরুতেই আমেরিকার নাগরিক রেভারেন্ড জোন্স আমেরিকা থেকে তার সকল শিষ্যসহ গায়ানার জঙ্গলে একটি চার্চ "পিপল'স টেম্পল" নামে এক উপসনালয় খুলে নিজস্ব উপধর্মীয় বা "কাল্ট" গ্রুপের শহর জোন্স টাউন গড়ে তুলেছিলেন। এরপর ১৯৭৮ সালের নভেম্বরে তিনশত শিশু সহ ৯১৮ জন একসাথে আত্মহত্যা করেছিল। আমি বহুকাল পর্যন্ত এটাকে গণ আত্মহত্যা হিসেবেই জানতাম। একসময় জানলাম, না, আমার জানায় ভুল ছিল, জোন্স তাদেরকে অস্ত্রের মুখে বাধ্য করেছিল বিষপানে আত্মহত্যা করতে, সুতরাং, এটা অবশ্যই একটা হত্যাকান্ড। ঐদিন যদি জোন্সের লোকজন তাদের জোন্সটাউন পরিদর্শনে আসা আমেরিকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সহ তার সফরসঙ্গী আমেরিকার প্রথিতযশা তিনজন সাংবাদিককে হত্যা না করতো তাহলে হয়তো অনেকের কাছেই এই ইতিহাস কুয়াশাচ্ছন্নই থেকে যেতো। এরপরো, আজকেও পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে যারা এই হত্যাকান্ডকে কুয়াশার চাদরে ঢেকে রেখে আত্মহত্যা বলে প্রচারে ব্যাস্ত।

ইতিহাস কুয়াশাচ্ছন্ন থাকলে কিছু মানুষ লাভবান হয় ধরনের লোকের অভাব বাংলাদেশে কখনোই ছিলনা, সুতরাং, অদ্ভুৎ ইতিহাস তৈরী হবার আগেই সম্পুর্ন এবং সঠিক রাজাকারের তালিকা প্রণয়নের সৎসাহস ও ক্ষমতা না থাকলে এই বিভ্রান্তিকর তালিকা প্রত্যাহার করার আহ্বান শুধু নয়, আমি দাবী জানাচ্ছি।